

বড় হওয়ার শিক্ষা কত দূর?

পাঠ্য পুস্তক

আবুল মোমেন



২০১৭ সালের পাঠ্যবইয়ে বেশ কিছু ভুল পাওয়া গেছে, এ নিয়ে দৈনিক পত্রিকা, বৈদ্যুতিন গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শোরগোল উঠেছে। এ থেকে ভাবা যেতে পারে যে জাতি শিক্ষা নিয়ে বেশ সচেতন হয়ে উঠেছে। সমালোচনার এমন বাড়ির প্রতিক্রিয়ায় সাধারণত যা ঘটে, তা হলো, নামীদামী ব্যক্তিদের নিয়ে বড়সড় তদন্ত কমিটি বা পর্যালোচনা কমিটি গঠন করে গণ-অসন্তোষ ও সংবাদমাধ্যমের শোরগোল আপাতত সামাল দেওয়ার চেষ্টা করা। এবারেও তার ব্যতিক্রম হয়নি, ভারী নামের দু-দুটি কমিটি গঠন করে আপাতত গণ-অসন্তোষ ও গণমাধ্যমকে শান্ত করার চেষ্টা চলছে। এর মধ্যে এনসিটিবির দুজনকে ওএসডি করা হয়েছে, একজন চিত্রকরের ওপর কোপ পড়েছে। তবে আমরা তো জানি এ ধরনের কমিটি কর্তৃপক্ষকে সাময়িক সুরক্ষা দিতে পারে বটে, কিন্তু পাঠ্যপুস্তক রচনা বা সংশোধন তাদের সভা ও সিদ্ধান্তে সুসম্পন্ন হওয়ার নয়। এর একটি স্থায়ী সুদৃঢ় ব্যবস্থাপনা থাকা দরকার, যার অভাব রয়েছে বলে মনে হয়।

যেসব ভুল নিয়ে ইইচই উঠেছে, তার সবই এক মাত্রার নয়। আঘাত বোঝাতে hurt-এর স্থলে heart শব্দের প্রয়োগ নেহাত লেখার (স্লিপ অব পেন) বা প্রুফের প্রমাদ বলেও অনেকে যুক্তি দিতে পারেন। তাঁরা যদি বলেন—যেকোনো স্থলের শিক্ষকই তা দেখামাত্র শুদ্ধ করে দেবেন, দেওয়ার কথা। সেকথাও হয়তো নাকচ করে দেওয়া যাবে না। বোর্ডও নিজস্ব ব্যবস্থায় এ বিষয়ে বিদ্যালয়গুলোতে নির্দেশনা পাঠাতে পারে।

প্রত্নপত্রিকার মাধ্যমে যেসব ভুল সম্পর্কে জানতে পারলাম, তাতে মনে হয় ভুলের উৎস বা কারণ মূলত তিনটি: ১. শিক্ষাবর্ষের প্রথম দিনে বিপুল বই প্রস্তুত করে বিতরণের চাপ; ২. লেখক ও বিশেষজ্ঞদের সময়-সংকট এবং তাঁদের মধ্যে অনেকের দক্ষতা ও আন্তরিকতার অভাব; ৩. সমাজমানসে পুঞ্জীভূত সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় রাজনীতির চাপ ও কৌশলী পদক্ষেপ।

এবার আমরা সমস্যাগুলোর সমাধানে কিছু পরামর্শ দিতে পারি কি না দেখি, যদিও তা শোনার সম্ভাবনা কম।

এক ফি বছর স্কুলে ছাত্র বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বইয়ের কপির সংখ্যাও বাড়তে থাকবে। গত কয়েক বছরের ধরন দেখে মনে হয়, বছরে গড়ে দুই কোটি করে কপি সংখ্যা বাড়ছে। এ ক্ষেত্রে আমার দুটি বিনীত নিবেদন আছে—প্রথমত, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরকে দুই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সার্বিকভাবেই ভাগ করে দেওয়া উচিত। সেভাবে এনসিটিবিরও প্রাথমিক ও মাধ্যমিক দুই ভাগ হওয়া বাঞ্ছনীয়। দ্বিতীয়ত, আমাদের মতো দরিদ্র দেশে কেন সক্ষম ও অক্ষম উভয় ধরনের পরিবারকে বিনা মূল্যে বই দেওয়া অপরিহার্য ভাবছে সরকার? এটা আমার বোধগম্য নয়। শুধু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে-ঢালাওভাবে বিনা মূল্যে বই দেওয়া যায়, অন্যত্র তার প্রয়োজন নেই। স্কুল কর্তৃপক্ষ মেধাবী ও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের বৃত্তির যোগ্যতা যেভাবে নির্ধারণ করে, এ ক্ষেত্রেও সেভাবেই বিনা মূল্যে বই পাওয়ার উপযুক্ত শিক্ষার্থীদের নির্বাচন করবে। তারপরও এতে যেটুকু সমস্যা হবে তা নীতিগত নয়, ব্যবস্থাপনার সমস্যা। আমার ধারণা, এটা কোনো বড় সমস্যা নয়। এভাবে যে বিপুল অর্থ সাশ্রয় ও আয় হবে, তা স্কুলশিক্ষায় ব্যয় করা হলে শিক্ষার মান বাড়ানোর জন্য অনেক কাজ করা যাবে। শিক্ষক-সংকট, পাঠাগার ও গ্রন্থাগারিকের অভাব, বিজ্ঞান গবেষণাগার ও সহায়ক কর্মীর সংকট, খেলাধুলার অভাব ইত্যাদি স্কুলশিক্ষার বহু জরুরি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংযোজন করা যাবে।

দুই. পাঠ্যবইয়ের রচয়িতা ও সম্পাদক নির্বাচনের মাপকাঠি সম্পর্কে আমি জানি না। তবে স্কুলশিক্ষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থেকে জানি আমাদের পাঠ্যবইয়ের ভাষা বড় গতানুগতিক, প্রাণহীন, শিশুমনকে উদ্দীপ্ত করার মতো সমৃদ্ধ নয়। যা-বা সাহিত্যের বইগুলো থেকে শিশুরা উদ্দীপনা পেতে পারত, তাতেও বাদ পেয়েছে দিনে দিনে এমন সৃজনশীল লেখার সংখ্যা কমতে থাকায়। আমাদের বিবেচনায় থাকা দরকার কোন ভাষা প্রাণবন্ত, কোনটি নিঃপ্রাণ, কার ভাষা সরস, কারটি নীরস, কোনটিতে আছে কল্পনাকে মুক্তি দেওয়ার রসদ আর কোনটি বন্ধ ভাষা ইত্যাদি। কারও কারও ভাষা বন্ধা, আড়ষ্ট, তাই শিশুর কল্পনা ও ভাবনাকে জাগাতে পারে না। ভাষাবোধের এই সংবেদনশীলতা ছাড়া কীভাবে শিশুদের জন্য যথার্থ শৈলীর লেখা নির্বাচন বা গ্রণয়ন করা যাবে?

বই উৎসব

যেকোনো শিক্ষার্থীর বিদ্যাচর্চায় অগ্রগতি অনেকাংশে নির্ভর করে তার গদ্যের ওপর এবং এ জন্য তা প্রাজ্ঞ ও গতিশীল হওয়া জরুরি। এমন গদ্য লেখার যোগ্যতা অর্জন শিক্ষার একটি বড় কাজ। প্রমিত ভাষায় নিজের ভাব-বক্তব্য প্রকাশের দুর্বলতা যেকোনো জাতিকে মেধাচর্চায় পিছিয়ে দেবে—এটা মনে রাখা উচিত।

এটুকু বাড়তি কথাই পরে বলতে চাই যে লেখক ও সম্পাদক নির্বাচনে আরও মনোযোগী হতে হবে। আর বছরের শুরুতেই পরবর্তী বছরের বই রচনা (যদি প্রয়োজন থাকে), পরিমার্জন, সম্পাদনার কাজ শুরু করে দেওয়া উচিত। যাঁরা বাইরে থেকে যুক্ত হবেন, তাঁদের অবশ্যই অন্তত ছয় মাসের ছুটি নিয়ে সম্পূর্ণ দায়িত্বের সঙ্গে কাজ করতে হবে। তাঁদের মূল চাকরি ও আর্থিক সুবিধাদির বিষয় সরকারকে দেখতে হবে।

তিন. আমরা সবাই জানি দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তি মুক্তিযুদ্ধ ও জাতির মনস্তত্ত্ব থেকে সম্পূর্ণ ছাঁড়াতে পারিনি; বরং সাম্প্রতিক কালে ইসলামি জড়িদের প্রভাব বাড়ায় এ সংকট বেড়েছে। তাই কীভাবে শিক্ষায় সাম্প্রদায়িক মনোভাব ও ধর্মাত্মক ছাঁড়ায়, তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানা উচিত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের। তারপর সে অনুযায়ী শিক্ষা থেকে ধর্মাত্মকতা ও সাম্প্রদায়িকতা নির্মূলের কৌশল ও ব্যবস্থাপিত নির্ধারণ করা সম্ভব হবে। সেই সচেতনতার অভাব যে প্রকট, তা বোঝা যায় যখন হেফাজতে ইসলামের দাবি মেনে পাঠ্যবইয়ে অন্তর্ভুক্ত রচনা ও লেখকের রদবদল হওয়ায়। এই মনস্তত্ত্বের যে দীর্ঘ ইতিহাস আছে, তা-ও জানা দরকার। ১৯৬৭ সাল থেকে ফাংশনাল ইংরেজির অত্যন্ত চালু একটি বই হলো অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক কলিমদান খানের A Book of Grammar, Translation & Composition। এর ১১০ পৃষ্ঠায় ট্রান্সলেশনে পরপর কয়েকটি বাক্য এর রকম—বাংলাদেশেরা সাহসী, ইংরেজেরা পরিশ্রমী, মুসলমানরা সত্যবাদী, হিন্দুরা

মূর্তিপূজক। এতে সাহস, শ্রমশীলতা, সত্যবাদিতার মতো গুণবাচক বিশেষণগুলো যেভাবে বসানো হয়েছে, তাতে একদিকে শিশুদের বুঝতে কষ্ট হবে যে কেউ কেউ যুগপৎ কয়েকটি গুণের অধিকারী হতে পারে। আবার অন্যদিকে হিন্দুর বেলায় যে পরিচিতি দেওয়া হয়েছে, তা কোনো গুণ প্রকাশ করে না। এতে সামাজিকভাবে তাদের অবনমন ঘটে, যা পরিহার সাম্প্রদায়িক কাজ।

শিক্ষামন্ত্রী এ বিষয়ে অবগত ও সচেতন বলেই জানি। কিন্তু এ মানসিকতা তো কেবল প্রশাসনিক ও বিভাগীয়ভাবে মোকাবিলা করা যাবে না। রাজনীতি ও সমাজের পশ্চাদপসরণ ও ব্যর্থতার দায় কেবল পাঠ্যবইপ্রণেতা ও আমলার কাঁধে চাপালে চলবে কেন? তবে এ বিষয়ে তাদের অসচেতন থাকলেও চলবে না। আর বর্ণচোরা অনুপ্রবেশকারীদের না চিনলেও হবে না।

এখানেই বলে রাখব আমাদের বড় এক দুর্বলতার কথা, বইয়ের অলংকরণ। আমাদের চারুকলা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অলংকরণ, বৈজ্ঞানিক ড্রয়িং-স্কেচ, অক্ষরবিন্যাস ইত্যাদি উচ্চমানে শেখানো হয় না। বিদেশি বইয়ের তুলনায় এ ক্ষেত্রে আমরা অত্যন্ত দুর্বল এবং বিপুলভাবে পিছিয়ে আছি। কিন্তু শিশুদের বইয়ে ভালো মানের ছবি থাকা আবশ্যিক। যেহেতু এটি একটি সাংবাদিকগুরুত্বপূর্ণ কাজ, তাই যোগ্য লোকবল তৈরির জন্য আগ্রহী চারুশিল্পীর অন্তত ১০ জনের একটি দলকে দক্ষতা অর্জনের জন্য বিদেশে পাঠানো হোক। পরে তাঁরাই দেশে প্রশিক্ষণ দিতে পারবেন।

মূল তিনটি পর্যবেক্ষণের বাইরে আর দু-একটি সাধারণ কথা বলতে চাই। আমাদের শিক্ষায় বিপুল জ্ঞানচর্চা, উপভোগ, সৃজন, মৌলিক চিন্তা ও বিশ্লেষণের অবকাশ নেই বললেই চলে, পরীক্ষার চাপে ও আধিক্যে শিক্ষার আসল লক্ষ্য অনর্জিত থেকে যাচ্ছে। আমরা এমন উচ্চ ডিগ্রিধারীদের পাচ্ছি, যাঁরা চিন্তা করতে, গুছিয়ে কোনো বিষয়ে ব্যাখ্যা

দিতে, শুদ্ধভাবে লিখে বক্তব্য প্রকাশ করতে পারেন না। তাই দেশে নয়, বিদেশে গিয়েই আমাদের মেধাবীরা নিজ নিজ মেধার প্রকাশ ঘটাতে পারছেন। এ দেশের অদম্য মেধাবীরা কেবল জিপিএ-৫ পেতে পারে। সমাজে জ্ঞানের সত্যিকারের চাহিদাই তৈরি হয়নি, এটা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মস্ত দুর্বলতা।

এই দুর্বলতার সূত্র ধরে এ ব্যবস্থায় পাঠ্যবই (এবং জ্ঞানার্জন ও নির্মল আনন্দের জন্য বই পড়া), শ্রেণিকক্ষের পঠনপাঠন এবং সেই সূত্রে স্কুল ক্রমেই গুরুত্বহীন হয়ে পড়ছে। গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে গ্রন্থ ও উত্তরসংবলিত গাইড বই, পরীক্ষায় দক্ষ হয়ে ওঠার কোচিং সেন্টার এবং মুখস্থবিদ্যা।

আরেকটা কথা বলতে চাই, আমাদের দেশে নারী শিক্ষার্থীর ওপর বইয়ের বোঝা বেশি। কথটা সত্য হলেও বাস্তবে পঠনপাঠন কম, আজকালকার শিক্ষার্থীরা লুকিয়ে নভেল-নটিক পড়ে না, স্কুলে লাইব্রেরির চলও উঠে গেছে। তাহলে? বোঝা বাড়ল কীভাবে? না, এ হলো পরীক্ষার বোঝা, পাঠ্যবইয়ের চেয়ে গাইড বই ভারী, এক শিক্ষার্থীর বিদ্যালয় একটি হলেও কোচিং সেন্টার হয় একাধিক, পড়াশোনার চেয়ে পরীক্ষার জন্য খাতার বোঝা অনেক বেশি। শিক্ষার্থীরা সেগুলো টানে।

উন্নত বিশ্বে স্কুলপর্যায়ের বই কিন্তু নিজ ভাষার রূপদী সাহিত্যের সঙ্গে শিক্ষার্থীরা পরিচিত হয়। প্রচুর বই পড়ে তারা। ১০ থেকে ১২ বছর স্কুলে পড়ে আমাদের শিক্ষার্থীরা বাংলা সাহিত্যের কটা বই পড়ে? বহু বই তো বহু আগেই তামাদি হয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ-শরচ্চন্দ্র-নজরুলেরাও বাসি হয়ে পড়েছেন। সম্প্রতি পাঠ্যবইবহির্ভূত সাহিত্যপাঠের জন্য সরকার বিদেশি সাহায্য নিয়ে বড় কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। কিন্তু পরীক্ষাময় শিক্ষায় তা সাহিত্য ও জ্ঞানচর্চার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারবে বলে বিশ্বাস হয় না।

সব শেষে বলতেই হবে, আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনে এবং তাই শিক্ষাজীবনেও, ধর্মাত্মক সাম্প্রদায়িক শক্তি তাদের প্রভাব এখনো বহাল রেখেছে; বরং দিনে দিনে আরও জোরালোভাবে তা ছড়াচ্ছে। হেফাজতে ইসলাম পাঠ্যবইয়ে পরিবর্তনের জন্য যেমন সরকারকে ধন্যবাদ দিয়েছে, তেমনি আবার ভবিষ্যতে আরও দাবি তোলার ইশিয়ারিও জানাচ্ছে। হায় স্বাধীন বাংলাদেশে, শেখ হাসিনার বাংলাদেশে, শেষ পর্যন্ত মূলধারার শিক্ষা কণ্ঠমি খাদ্যসার আদর্শেই বুঝি টেলে সাজানোর কাল আসছে।

লাখো জিপিএ-৫ তারকার মরীচিকার আলোয় আমরা বুঝি আসল ক্ষেত্রে পথ হারাতে বসেছি। একদিকে পরীক্ষার ফল নিয়ে উৎসবে মেতে উঠছে জাতি আর অন্যদিকে শিক্ষার যাত্রাপথ ভুলভ্রান্তি ও ধর্মাত্মতার অন্ধকারে ঢেকে যাচ্ছে। এভাবে চললে আমাদের দেশে কবে সেই ছেলে হবে (এবং অবশ্যই মেয়ে), যে কথায় বড় না হয়ে কাজে বড় হবে?

● আবুল মোমেন: কবি, প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক